Indian Journal of Multidisciplinary Research and Studies
ISSN: 3108-1681 | Volume- 2, Issue- 2 | April - June 2026

স্মৃতিশাস্ত্রের দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতীয় নারী : একটি সমীক্ষামূলক আলোচনা

সৌমেন সাহা
সহকারী অধ্যাপক, শালডিহা কলেজ, বাঁকুড়া

সারসংক্ষেপ:

ধর্মশাস্ত্রের বা স্মৃতিশাস্ত্রের দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান এক জটিল ও বহুমাত্রিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রতিফলন। এই গবেষণায় বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে স্মৃতি, সূত্র, ব্রাহ্মণ, মহাকাব্য এবং পরবর্তী গুপ্ত ও মধ্যযুগ পর্যন্ত নারীর সামাজিক, ধর্মীয় ও বৌদ্ধিক অবস্থানের ধারাবাহিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বৈদিক যুগে নারী ছিলেন শিক্ষিত, স্বাধীন ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে সমান অংশীদার; গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রার মতো বিদুষী নারীরা জ্ঞানচর্চা ও দার্শনিক বিতর্কে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী উত্তর বৈদিক ও ব্রাহ্মণ যুগে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে নারীর স্বাধীনতা কিছুটা সীমিত হলেও পরিবার ও ধর্মীয় জীবনে তার গুরুত্ব অটুট থাকে।সূত্রযুগে নারীর বৈদিক অধিকার সংকুচিত হয়ে তার ভূমিকা মূলত গৃহস্থ জীবনে কেন্দ্রীভূত হয়। স্মৃতিযুগে মনুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির আলোচনায় নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেলেও তার ব্যক্তিস্বাধীনতা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পিতা, স্বামী ও পুত্রের অধীনস্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূর মতো শ্রেণিবিভাগের মাধ্যমে নারীর শিক্ষাগত অবস্থান আংশিকভাবে স্বীকৃতি পায়। মহাকাব্য যুগে নারীকে "অর্ধাঙ্গিনী" রূপে কল্পনা করে পারিবারিক ও নৈতিক আদর্শের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা হয়।গুপ্ত ও মধ্যযুগে নারীর অবস্থান দ্বৈত প্রকৃতির হয়ে ওঠে; একদিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা ও সতীদাহের মতো সামাজিক বিধিনিষেধ তার স্বাধীনতাকে সীমিত করে। সমগ্র আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান কখনো সম্পূর্ণ স্বাধীন, কখনো বা নিয়ন্ত্রিত এই দ্বৈততার মধ্য দিয়েই তার ঐতিহাসিক বিবর্তন গড়ে উঠেছে। নারী জ্ঞান, ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে সমাজকে সমৃদ্ধ করেছেন, যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাধীনতার পরিসর পরিবর্তিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: স্মৃতিশাস্ত্র, বৈদিক যুগ, মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, ব্রহ্মবাদিনী, অর্ধাঙ্গিনী, নারী শিক্ষা

ভুমিকা:

প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা মূলত ধর্মশাস্ত্রনির্ভর ছিল এবং এই সমাজে নারীর স্থান ও মর্যাদা এক গভীর ও বহুমাত্রিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রতিফলন। বৈদিক, ব্রাহ্মণ , সূত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনায় নারীর যে চিত্র প্রত্যক্ষ করি, তা কখনো অত্যন্ত গৌরবময়, আবার কখনো সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত এই দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়েই তার প্রকৃত অবস্থান নিরূপিত হয়। শ্রুতি বা বেদ থেকে শুরু করে স্মৃতি, ব্রাহ্মণ, সূত্র, গুপ্ত ও মধ্যযুগ পর্যন্ত সর্বত্রই নারী কেবল পুরুষের সহধর্মিণী নন, বরং জ্ঞান, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক চেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ ধারক হিসেবেও

Published: 05 May 2026
DOI: https://doi.org/10.70558/IJMRS.2026.v2.i2.301116
Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

প্রতিভাত।ঋগ্বেদীয় যুগে নারীর অবস্থান ছিল বিশেষভাবে উজ্জ্বল ও সম্মানজনক। গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা প্রমুখ বিদুষী নারীরা শুধু শিক্ষালাভই করেননি, বরং দার্শনিক বিতর্ক ও জ্ঞানচর্চায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলেছিলেন। সেই সময় যজ্ঞসহ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নারীর উপস্থিতি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হতো, যা তাদের আধ্যাত্মিক সমানাধিকারের স্পষ্টতা বহন করে। শিক্ষা, সামাজিক স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ—এই তিন ক্ষেত্রেই বৈদিক যুগে নারীরা উল্লেখযোগ্য অধিকার ভোগ করত।কিন্তু সময়ের প্রবাহে, বিশেষত স্মৃতি যুগে এসে নারীর অবস্থানে একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মনুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির মতো গ্রন্থে নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের কথা বলা হলেও তার ব্যক্তিস্বাধীনতা অনেকাংশে সীমাবদ্ধ করা হয়। নারীকে পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রেখে তাকে পিতা, স্বামী ও পুত্রের অধীনস্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নারীর গুরুত্ব কমে যায়নি; বরং পরিবার রক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা আরও সুসংহত ও অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় নারীকে কেবল একটি সামাজিক সত্তা হিসেবে নয়, বরং ‘প্রকৃতি’ ও ‘শক্তি’র মূর্ত প্রতীক হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। এই ধারণা নারীর অন্তর্নিহিত সৃজনশীলতা, সহনশীলতা ও জীবনধারণের শক্তিকে স্বীকৃতি দেয়। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বিভিন্ন আখ্যানেও নারীর এই তেজ, ধৈর্য ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যা সমাজজীবনে তার অপরিহার্য ভূমিকারই পরিচয় বহন করে।অতএব, প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান একরৈখিক নয়; বরং এটি একটি পরিবর্তনশীল ও বহুমাত্রিক বাস্তবতা। বৈদিক যুগের স্বাধীন, শিক্ষিতা ও সম্মানিত নারী থেকে শুরু করে স্মৃতি যুগের নিয়ন্ত্রিত কিন্তু মর্যাদাসম্পন্ন নারীর এই রূপান্তর আমাদের সামনে এক সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা উপস্থাপন করে। এই ধারার মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয় যে, নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নারী তাঁর জ্ঞান, নীতি ও সাংস্কৃতিক অবদানের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।

বৈদিক-যুগে নারীর অবস্থান

বৈদিক যুগের সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ পর্যন্ত। এই যুগে নারীর জীবন ছিল উন্মুক্ত, সক্রিয় এবং মর্যাদাপূর্ণ। পরিবার ছিল সমাজের মূল ভিত্তি, এবং নারী (গৃহিণী) সেই পরিবারের ভারসাম্য ও শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তাই ঋগ্বেদে উক্ত হয়েছে -

সমরশি স্বশুরে ভব সমরশি স্বশ্রাং ভব ।

ননান্দরি সমরশি ভব সমরশি দেবৃভিঃ ॥[1]

শুধুমাত্র গৃহস্থ জীবনের সীমায় আবদ্ধ রাখা হয়নি; বরং নারীদের জ্ঞান, ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবেও দেখা হতো। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য কোনো কঠোর বাঁধা ছিল না। তারা উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমে বৈদিক শিক্ষায় প্রবেশ করত এবং বেদ, ব্রাহ্মণ ও দর্শনচর্চায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করত।এই যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—নারীরা জ্ঞানসৃষ্টিতেও অংশ নিয়েছিল। ঋগ্বেদের বহু সূক্ত নারীদের দ্বারা রচিত, যা তাদের বৌদ্ধিক স্বাধীনতার প্রমাণ দেয়। লোপামুদ্রা, অপলা, ঘোষা প্রমুখ নারীরা কেবল ধর্মীয় বিষয়ই রচনা করেননি, বরং গভীর দার্শনিক ভাবনাও প্রকাশ করেছেন।[2] এইভাবে বৈদিক যুগে নারীরা ছিলেন এক স্বাধীন ও সৃজনশীল সত্তা, যাঁদের উপস্থিতি সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

উত্তর-বৈদিক ও মহাকাব্য-যুগে নারীর অবস্থান

উত্তর-বৈদিক যুগের সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০০–৫০০ অব্দ এবং মহাকাব্য যুগের সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬০০–২০০ অব্দ পর্যন্ত। উত্তর-বৈদিক যুগে সমাজের কাঠামো ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে, এবং সেই পরিবর্তনের প্রভাব নারীদের ওপরেও পড়ে। পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় এই সময় নারীর জীবন অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সীমিত হলেও তার সামাজিক গুরুত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়নি।এই পর্যায়ে নারীর প্রধান পরিচয় হয়ে ওঠে পরিবারকেন্দ্রিক। স্ত্রী ও মাতার ভূমিকাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদিও কিছু নারী পরবর্তী সময়েও জ্ঞানচর্চায় যুক্ত ছিলেন, তবে সাধারণভাবে শিক্ষার সুযোগ আগের মতো বিস্তৃত ছিল না। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও নারীর স্বতন্ত্র ভূমিকা কিছুটা কমে যায়, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে যৌথভাবে ধর্মাচরণ করার প্রথা বজায় থাকে।

মহাকাব্য-যুগে এসে নারীর অবস্থানের একটি ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। একদিকে সমাজে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে নারীর মর্যাদা ও সম্মান বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হয়। মহাভারত-এ স্ত্রীকে সম্মান করার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে এবং তাকে গৃহের সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।[3] অন্যদিকে রামায়ণ-এ সীতার চরিত্র নারীর আদর্শ রূপ হিসেবে প্রতিভাত হয়—যেখানে ধর্মনিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা ও কর্তব্যবোধের এক অনন্য সমন্বয় দেখা যায়। এই যুগে "অর্ধাঙ্গিনী" ধারণাটি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা পায়, যার মাধ্যমে বোঝানো হয় যে স্ত্রী ও স্বামী একে অপরের পরিপূরক।সব মিলিয়ে, উত্তর বৈদিক ও মহাকাব্য যুগে নারীদের অবস্থান ছিল এক পরিবর্তনের মধ্যবর্তী স্তর—যেখানে স্বাধীনতা কিছুটা কমলেও মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা অটুট ছিল।

ব্রাহ্মণ-যুগে নারীর অবস্থান

ব্রাহ্মণ-যুগের সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দ পর্যন্ত। এই-যুগে বৈদিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের অবস্থানেও কিছু রূপান্তর দেখা যায়। পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় নারীদের স্বাধীনতা কিছুটা সীমিত হলেও, সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ধরে রেখেছিলেন। এই সময়ে নারীদের প্রধান ভূমিকা ছিল গৃহস্থ জীবন ও পারিবারিক দায়িত্ব পালন করা। বহু যজ্ঞে[4] তাঁদের উপস্থিতি অপরিহার্য ছিল, যদিও তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে যজ্ঞ সম্পাদনের অধিকার হারান।এর ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা অংশগ্রহণমূলক হলেও নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের সুযোগ কিছুটা কমে যায়, তবে তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়নি। কিছু বিদুষী নারী তখনও জ্ঞানচর্চায় অংশ নিতেন।এই যুগে মাতার মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ ছিল এবং পরিবারে তাকে বিশেষ সম্মানের আসনে রাখা হতো। তবে ধীরে ধীরে নারীর স্বতন্ত্র অধিকার কমে গিয়ে পারিবারিক কাঠামোর ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।অতএব, ব্রাহ্মণ-যুগে নারীদের অবস্থান ছিল এক পরিবর্তনশীল পর্যায়—যেখানে পূর্ববর্তী স্বাধীনতা কিছুটা হ্রাস পেলেও পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে গুরুত্ব বজায় ছিল।

সূত্রযুগে নারীর অবস্থান

ব্রাহ্মণ-যুগের পরবর্তী সূত্রযুগে নারীর অবস্থানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।সূত্র যুগের সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ পর্যন্ত। এই সময়ে বৈদিক ধর্মীয় অধিকার অনেকাংশে

সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং নারীকে পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সীমিত সামাজিক ও ধর্মীয় ভূমিকায় দেখা যায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে নারীকে শূদ্রের সমতুল্য বলে বিবেচনা করার প্রবণতাও দেখা যায়।

এই যুগে আচার্য আপস্তম্ব স্ত্রীদের জন্য সাবিত্রীদীক্ষা, যজ্ঞোপবীত ধারণ এবং কিছু বৈদিক আচার নিষিদ্ধ করেন। তাঁর মতে নারীর প্রধান সংস্কার হলো বিবাহ, অন্য বৈদিক সংস্কারগুলো তার জন্য প্রযোজ্য নয়।[5] অনুরূপভাবে গৌতম বৈদিক কর্মে নারীর স্বতন্ত্র অধিকার স্বীকার করেননি। বৌধায়ন নারীর বেদমন্ত্রে অধিকার অস্বীকার করেন, এবং বসিষ্ঠ নারীর আচমনেও সীমাবদ্ধতা আরোপ করেন।[6] অন্যদিকে কিছু শাস্ত্র মতে নারীর জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সংস্কার অমন্ত্রকভাবে সম্পন্ন হতো বলে উল্লেখ আছে। বিষ্ণু ও আশ্বলায়ন[7] গৃহ্যসূত্রেও এই ধরনের বিধিনিষেধের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। বিবাহই তার প্রধান ধর্মীয় সংস্কার হিসেবে স্বীকৃত ছিল এবং গৃহস্থ জীবনে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।সব মিলিয়ে বলা যায়, সূত্রযুগে নারীর অবস্থান পূর্ববর্তী যুগগুলোর তুলনায় অধিক নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত হয়ে পড়ে, যেখানে তার বৈদিক অধিকার সংকুচিত হয়ে পারিবারিক ভূমিকাই প্রধান হয়ে ওঠে।

স্মৃতিযুগে নারীর অধিকার:

স্মৃতি-যুগের সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। জৈমিনির পরবর্তী সময়ে ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিসাহিত্যে নারীর বৈদিক অধিকার নিয়ে নতুনভাবে আলোচনা শুরু হয়। বিশেষ করে স্ত্রীর বেদমন্ত্র পাঠ ও বৈদিক কর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকার আছে কি না—এই প্রশ্নটি স্মৃতিকারদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। এই আলোচনায় একাধিক মতভেদ দেখা যায়।মাধব বিদ্যারণ্য তাঁর রচনায় পরাশরস্মৃতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নারীদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। ব্রহ্মবাদিনীরা ছিলেন সেই নারী, যাঁরা উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র এবং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্যার মাধ্যমে বৈদিক জীবনযাপন করতেন। অন্যদিকে সদ্যোবধূরা বিবাহের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত নারী, যাঁদের ক্ষেত্রে উপনয়ন সংস্কার কেবল প্রতীকীভাবে সম্পন্ন করে বিবাহের মাধ্যমে তাদের সামাজিক জীবন শুরু হতো। এই প্রসঙ্গে মনুস্মৃতি এ বলা হয়েছে –

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।

পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোহগ্নিপরিক্রিয়া।।[8]

অর্থাৎ সদ্যোবধূদের ক্ষেত্রে বিবাহই প্রধান সংস্কার। বিবাহের মাধ্যমেই তাদের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন বলে ধরা হয়। এই মত অনুযায়ী নারীর ধর্মীয় জীবন মূলত স্বামীর সেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। পতিসেবা, গৃহস্থ কর্তব্য পালন এবং পারিবারিক দায়িত্বই তাদের প্রধান ধর্ম বলে বিবেচিত হয়। গৃহকর্মই তাদের নিত্য অগ্নিহোত্রের সমতুল্য বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।এছাড়া যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাসের মতো স্বতন্ত্র ধর্মাচরণে নারীর সরাসরি অধিকার স্বীকৃত নয় বলেও এই মতপক্ষ উল্লেখ করে। শরীরশুদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্কার ক্রমান্বয়ে অমন্ত্রকভাবে সম্পন্ন করার কথাও বলা হয়েছে।[9] এই মতের সমর্থনে হারীত-এর অবস্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্মৃতিসাহিত্যে নারীর বৈদিক অধিকার নিয়ে আলোচনায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মত পাওয়া যায় স্মৃতিকার যম-এর মাধ্যমে। তাঁর মতে, বর্তমান যুগে নারীর বেদে অধিকার স্বীকৃত নয়; এই অধিকার মূলত কল্পান্তর বা প্রাচীন যুগের বিষয়। অর্থাৎ, নারীর বৈদিক স্বাধীনতা ছিল অতীত কালের একটি বাস্তবতা, বর্তমান যুগে তা প্রযোজ্য নয়।যমের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, পূর্ব কালে কুমারী অবস্থায় নারীরা পুরুষদের মতোই মৌঞ্জীবন্ধন, বেদাধ্যয়ন, বেদপাঠ এবং গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণসহ বিভিন্ন বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত।[10] তবে সেই যুগেও তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে

কিছু নিয়ম ছিল—তারা কেবল পিতা, পিতৃব্য বা ভ্রাতার কাছেই বেদ অধ্যয়ন করতে পারত এবং স্বগৃহেই ভিক্ষাচর্যা সম্পাদন করতে হত। এছাড়া অজিন ধারণ, চীর ও জটাধারণের মতো কিছু ব্রত তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।এই মতের ব্যাখ্যা ও সমর্থন প্রসঙ্গে মাধব বিদ্যারণ্য যমের বক্তব্যকে গ্রহণ করে পূর্বপক্ষের ভিন্ন মত খণ্ডন করেছেন এবং "মৈবম্" যুক্তির মাধ্যমে তাঁর সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানান।

মনুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি—উভয় স্মৃতিশাস্ত্রেই নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সামাজিক গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।মনুর মতে, যে পরিবারে স্ত্রীলোককে বস্ত্র ও অলংকার দ্বারা সম্মানিত করা হয়, সেই পরিবারে দেবতাদের প্রসন্নতা বজায় থাকে। অপরদিকে, যে কুলে কন্যা বা স্ত্রীদের প্রতি অবহেলা ও দুঃখের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সেই পরিবার ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। তাই মনু নির্দেশ দিয়েছেন যে, যারা সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য কামনা করেন, তাঁরা উৎসব ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে নারীদের যথাযথভাবে সম্মান ও অলংকার দ্বারা সন্তুষ্ট রাখবেন।অন্যদিকে যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, বংশবিস্তারই গৃহস্থ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, যা পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি অগ্নিহোত্রাদি ধর্মকর্মের মাধ্যমে স্বর্গলাভ সম্ভব হয়। তাই তিনি বলেছেন, সন্তানলাভের জন্য স্ত্রীর প্রতি যত্ন ও সেবা করা এবং ধর্মরক্ষার জন্য তাকে যথাযথভাবে পালন করা আবশ্যক। তাঁর মতে, বিবাহের মূল ফলই হল বংশবিস্তার এবং ধর্মীয় কর্তব্য পালনের অধিকার অর্জন।

লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ।

যস্মাত্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যা ভর্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ।।[11]

মনুস্মৃতি[12] এবং যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি[13] উভয় স্মৃতিশাস্ত্রে নারীর পারিবারিক অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দিষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। নারী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পুরুষের অভিভাবকত্বের অধীন থাকবেন।নারীর অনূঢ়া বা অবিবাহিত অবস্থায় তার দায়িত্ব পিতার উপর ন্যস্ত থাকে। বিবাহের পর তিনি স্বামীর অধীনে থাকেন। স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র তাঁর রক্ষক হন, এবং পুত্র না থাকলে ভর্তৃকুল বা স্বামীর পরিবারের সদস্যরা তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পতিহীনা নারীর ক্ষেত্রেও পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশুর বা মাতুল—এই সকল অভিভাবকের আশ্রয়ে জীবনযাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; অন্যথায় সমাজে তাকে নিন্দনীয় বলে বিবেচনা করা হত। মনুর মতে, নারী জীবনের তিনটি পর্যায়—বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য—যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তাকে পিতা বা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া স্বতন্ত্র কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়নি।অতএব, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়েই নারীর প্রতি অবহেলা নয়, বরং তাকে গৃহস্থ জীবনের অপরিহার্য অংশ ও সম্মানযোগ্য সহধর্মিণী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[14]

গুপ্ত ও মধ্যযুগে নারীর অবস্থান:

গুপ্ত ও মধ্যযুগে নারীর অবস্থান ছিল পরিবর্তনশীল ও দ্বৈত প্রকৃতির। গুপ্ত যুগের সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টাব্দ ৩২০–৫৫০ অব্দ এবং মধ্যযুগের সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টাব্দ ৬০০–১৭৫৭ অব্দ পর্যন্ত। গুপ্তযুগে নারীর সামাজিক মর্যাদা কিছুটা হ্রাস পেলেও সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হননি। এই সময়ে পণপ্রথা ও বাল্যবিবাহের প্রচলন বৃদ্ধি পায় এবং নারীর শিক্ষার সুযোগ মূলত উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবুও নারীরা নৃত্য, গীত ও বাদ্যচর্চার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন।মধ্যযুগের প্রারম্ভে নারীর অবস্থান কিছু ক্ষেত্রে উন্নত ছিল। রাজপরিবারে রাজ্যশ্রী-এর মতো শিক্ষিত নারী ছিলেন, যিনি ধর্ম ও শিক্ষায় পারদর্শী ছিলেন। একইভাবে ভাস্করাচার্য তাঁর কন্যা লীলাবতী-কে গণিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে গঙ্গাদেবী-সহ বহু মহিলা কবি কাব্যচর্চায় অবদান রাখেন এবং নারীর বৌদ্ধিক সক্ষমতার পরিচয় দেন।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগে নারীর সামাজিক অবস্থান ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। বিধবা বিবাহের বিরোধিতা, সতীদাহ প্রথার প্রচলন এবং মুসলিম শাসনের প্রভাবে পর্দাপ্রথা ও বাল্যবিবাহ আরও বিস্তার লাভ করে। যদিও বিজয়নগর রাজ্যের মতো কিছু অঞ্চলে নারীরা শিক্ষা, প্রশাসন ও সামরিক ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন।[15]

অতএব, গুপ্ত ও মধ্যযুগে নারীর অবস্থান একদিকে উন্নতি ও শিক্ষার ধারাবাহিকতা বহন করলেও অন্যদিকে সামাজিক বিধিনিষেধ ও প্রথাগত বাধার কারণে ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে পড়ে।

উপসংহার:

স্মৃতিশাস্ত্র ও প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয়-সাহিত্যিক ঐতিহ্যের আলোকে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, এটি কোনো একক বা স্থির ধারণা নয়; বরং সময় ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়েছে। বৈদিক যুগে নারী ছিলেন জ্ঞানচর্চা, ধর্মাচরণ ও সামাজিক জীবনের সক্রিয় অংশীদার, যেখানে তিনি স্বাধীনতা ও মর্যাদার এক উচ্চ অবস্থান উপভোগ করতেন। পরবর্তী উত্তর বৈদিক, ব্রাহ্মণ ও সূত্রযুগে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে নারীর বৈদিক অধিকার ও স্বাধীনতা ধীরে ধীরে সংকুচিত হয় এবং তিনি মূলত পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েন।স্মৃতিযুগে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ স্মৃতিকার নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করলেও তাকে পুরুষতান্ত্রিক পারিবারিক কাঠামোর অধীনস্থ হিসেবে উপস্থাপন করেন। তবুও ব্রহ্মবাদিনী নারীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ধারা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়নি। মহাকাব্যিক সাহিত্য নারীর আদর্শ রূপকে "অর্ধাঙ্গিনী" হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তার নৈতিক ও পারিবারিক গুরুত্বকে আরও সুদৃঢ় করে।গুপ্ত ও মধ্যযুগে নারীর অবস্থান একদিকে সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ হলেও, অন্যদিকে সামাজিক কুসংস্কার ও প্রথাগত বাধার কারণে তার স্বাধীনতা সীমিত হয়ে পড়ে। এই সমগ্র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারী কখনো স্বাধীন, কখনো নিয়ন্ত্রিত—এই দ্বৈত বাস্তবতার মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্ব বিকশিত হয়েছে।

---

[1] *ঋগ্বেদ*, ১০.৮৫.৪৬
[2] ঐ, ২.১.৭৯
[3] *মহাভারত*, অনুশাসন পর্ব, অধ্যায় ৪৬–৪৭
[4] *শতপথ ব্রাহ্মণ*, ৫.২.১.১০
[5] *আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র*, ১.১.১৮; ২.৭.১৫–১৮
[6] সাহা, বিশ্বরূপ, *ধর্মশাস্ত্রপরিচয়*, পৃ: ৫৭৮
[7] *আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র*, ১.১৬.১৬
[8] *মনুসংহিতা*, ২.৬৭
[9] ঐ, ২.৬৬
[10] সাহা, বিশ্বরূপ, *ধর্মশাস্ত্রপরিচয়*, পৃ: ৫৭৯
[11] *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*, ১.৭৮
[12] *মনুস্মৃতি*, ৫.১৪৮
[13] যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি, ১.৮৫
[14] মনুস্মৃতি, ৫.১৪৭
[15] সাহা, বিশ্বরূপ, *ধর্মশাস্ত্রপরিচয়*, পৃ: ৫৮১

গ্রন্থপঞ্জী

মূলগ্রন্থসমূহ :

- *আপস্তম্বধর্মসূত্র,* আপস্তম্ব, সম্পা. চিন্নস্বামী শাস্ত্রী, বেনারস, ১৯৩২ ।
- *আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র,* আপস্তম্ব, মুনশীরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪।
- *ঊনবিংশতিসংহিতা* , সম্পা. অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অনু. পঞ্চাননতর্করত্ন, ভারতীয়বিদ্যাশিক্ষাপরিষদ্, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।
- *ঋগ্বেদ্,* অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বিশাখাপত্তনম, ১৯৫০।
- *গৌতমধর্মসূত্র,* গৌতম, সম্পা. কুলমণিমিশ্র, পুরী, ১৯৯১ ।
- *নারদস্মৃতি* , নরদ, সম্পা. ও অনু. নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, এশিয়াটিক সোসাইটি, কোলকাতা, ১৯২৮ ।
- *বৌধায়নধর্মসূত্র,* বৌধায়ন, সম্পা. নরেন্দ্রকুমার আচার্য, বিদ্যানিধিপ্রকাশন, দিল্লি, ১৯৯৯।
- *বসিষ্ঠধর্মসূত্র* , বসিষ্ঠ, অনু. জিব্যুলর (ভলিউম ১৪), অক্সফোর্ড, ১৮৮০|
- *ভগবদ্গীতা,* সম্পা: জয়দয়াল গোয়েন্দকা, গীতা প্রেস, গোরখপুর।
- *মনুসংহিতা,* মনু, সম্পা: মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬।
- *মনুস্মৃতি,* সম্পা: জি. এন. ঝা, মতিলাল বেনারস দাস, দিল্লি, ১৯৯৯।
- *মহাভারত,* সম্পা: জয়দয়াল গোয়েন্দকা, গীতা প্রেস, গোরখপুর, ১৯২৩।
- *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি* , যাজ্ঞবল্ক্য, সম্পা. উমেশচন্দ্র পাণ্ডে, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী,২০০৮(পুনর্মুদ্রিত)
- *শতপথব্রাহ্মণ,* সম্পা: শাস্ত্রী, পণ্ডিত এ. চিন্নাস্বামী এবং অন্যান্য,চৌখাম্বা প্রকাশন্, বারাণসী ,১৯৫০।
- *শ্রীমদ্ বাল্মীকি রামায়ণ,* শ্রী ভিনেশ্বর ভেঙ্কটেশ্বর ট্রাস্ট, চেন্নাই, ১৯৯৮।

সহায়কগ্রন্থসমূহ :

- কাণে, পি.ভি., *হিস্ট্রি অব ধর্মশাস্ত্র,* ভাণ্ডারকার, ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ভলিউম১.২), পুনা, ১৯৬৮।
- পি. এস. জোশী, *কালচারাল হিস্ট্রি অব অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া,* ১৯৭৪।
- পাণ্ডে, রাজাবলী , *হিন্দু সংস্কার,* চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ১৯৫৭ খিষ্টীয় |
- পণ্ডা, সিতাংশুভূষণ , *ধর্মশাস্ত্রে ষোডশ সংস্কারাঃ,* রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠম্, তিরুপতিঃ, ২০১০ |
- সাহা, বিশ্বরূপ, *ধর্মশাস্ত্রপরিচয়,* কলকাতা, ২০০৪।